আমি বাজের মতই এক ক্রুদ্ধ গর্জন শুনেছিলাম—গো অন, চার্জ

‘রাত ১০টা থেকেই গোলাগুলি শুরু হয়ে গেল। দূর থেকে তখন গুলির শব্দ ভেসে আসছিল। দেখলাম প্রতিটি শব্দ-তরঙ্গের সাথে সাথে শেখ সাহেব সমস্ত ঘরটার মাঝে পাইচারী করছিলেন। অস্ফুটভাবে তিনি (বঙ্গবন্ধু) বলছিলেন- এভাবে বাঙালীকে মারা যাবে না। বাংলা মরবে না। রাত ১২টার পর থেকেই গুলির শব্দ এগিয়ে এলো। ছেলেমেয়েদের জানালা বন্ধ করতে যেয়ে দেখতে পেলাম পাশের বাড়ীতে সৈন্যরা ঢুকে পগেছে। স্পস্ট মনে আছে এ সময় আমি বাজের মতই এক ক্রুদ্ধ গর্জন শুনেছিলাম— গো অন, চার্জ —।’

১৯৭২ সালের ২৬শে মার্চ দৈনিক বাংলায় এক স্মৃতিচারণমূলক সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব এ কথা বলেন। সাক্ষাৎকারে সে রাতের অনেক কথাই উঠে এসেছে। এসব কথা ইতিহাসের বস্তুনিষ্ঠ তথ্য। নতুন প্রজন্ম এ থেকে জানতে পারবে ৩২ নম্বরে সে রাতে কি ঘটেছিল। দৈনিক বাংলা সাক্ষাৎকারটির শিরোনাম দিয়েছিল ‘প্রথম থেকেই ইয়াহিয়া পশুটাকে আমি বিশ্বাস করতাম না: বেগম মুজিব’। সাক্ষাৎকারটি হুবহু তুলে ধরা হলো:

“গত বছরের এই দিনের স্মৃতিচারণ করতে গেলে প্রথমেই আমার মন কেঁদে ওঠে। সেই ভয়াল ২৫শে মার্চের কালো রাত থেকে ১৬ই ডিসেম্বর পযর্ন্ত এ দেশের পরিজন-হারা লাখো লাখো পরিবারের কথা ভেবে অশান্ত হয়ে ওঠে মন। তাই পৃথক করে হিংস্র ঐ রাতের কোন কথা বলতে বা ভাবতে আমার মন সায় দেয় না। বললেন শেখ ফজিলতুন্নেসা মুজিব। কথা বলছিলাম ৩২ নং রোডের সেই। একটা বছর আগের একরাশ স্মৃতির ছায়ায় বসে বেগম মুজিব বলছিলেন অবিস্মরণীয় সেই ২৫শে মার্চের রাত ও তারও আগেকার দিনগুলোর কথা।

অসহযোগ আন্দোলনের সেই অনন্য দিনগুলো। ধনী-দরিদ্র শিক্ষিত-অশিক্ষিত বাংলার মানুষ এক হয়ে গেছে। ঠিক এমনি মুহুর্তে আলোচনার প্রস্তাব নিয়ে ইয়াহিয়া ঢাকা বাংলায় এলো। প্রথম থেকেই পাকিস্তানী নৃশংস এই পশুটাকে আমি বিশ্বাস করতে পারতাম না। আলোচনা বৈঠকের প্রথম থেকেই এক অশুভ কালো ছায়াকে আমি যেনো দেখতে পেয়েছিলাম

সেদিনের জাগ্রত বাংলার অঙ্গনে। শেখ সাহেবকেও আমি বলেছিলাম যারা তাঁকে আগরতলা মামলায় জড়িয়েছে, তারা ভালোভাবেই জানে যে শেখ সাহেব বাংলাদেশ আর বাঙালীদের চিন্তা-ভাবনাই করেন- পাকিস্তান প্রশ্নে তার আগ্রই নেই। পাকিস্তানের ক্ষমতা তারা শেখ সাহেবকে দেবে না। কাজেই আলোচনা আরম্ভ করে তারা অন্য কোন নতুন কৌশল বের করার সুযোগ খুঁজছে মাত্র। আমার কথা শেখ সাহেব শুনলেন। মুখে কিছুই বললেন না। তিনি দলীয় নেতাদের বৈঠক ছাড়া বাইরে তেমন কিছু বলতেন না তখন।

গত বছর ২৫শে মার্চের সকাল থেকে বাড়ির অবস্থা ভার ভার লাগছিল। দুপুর তখন প্রায় সাড়ে বারোটা। আমাদের বাসার সামনে দিয়ে সৈন্য বোঝাই দুটো ট্রাক চলে গেল। দোতলা থেকেই ট্রাকগুলো দেখে আমি নীচে নেমে এলাম। শেখ সাহেব তখনো আগত লোকদের সাথে কথাবার্তায় ব্যস্ত। তাঁকে ভেতরে ডেকে মিলিটারি বোঝাই গাড়ী সম্বন্ধে বলতেই দেখলাম পলকের তরে মুখটা খুব গম্ভীর হয়ে গেল। পরক্ষণেই তিনি বেরিয়ে গেলেন। সমস্ত দিনটা কেটে গেল থমথমে ভাবে। এলো রাত। সেই অশুভ রাত। রাত সাড়ে আটটায় তিনি সাংবাদিকদের বিদায় দিলেন। আওয়ামী লীগ সহকর্মীদেরও কিছু কিছু নির্দেশ দিয়ে দ্রুত বিদায় দিলেন।

রাত প্রায় ১০টার কাছাকাছি। বাগান থেকে এক ভদ্রলোক এসে শেখ সাহেবের সামনে একেবারে আছড়ে পড়লেন। তার মুখে শুধু এক কথা-আপনি পালান। বঙ্গবন্ধু পালান। ভেতর থেকে তার কথা শুনে শঙ্কিত হয়ে উঠলো আমারও মন। বড় মেয়েকে তার ছোট বোনটাসহ তার স্বামীর বাড়িতে পাঠিয়ে দিলাম। যাবার মুহুর্তে কি ভেবে যেনো ছোট মেয়েটা আমাকে আর তার আব্বাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদলো। শেখ সাহেব তার মাথায় হাত বুলিয়ে শুধু বললেন-বিপদে কাঁদতে নেই মা।

তখন চারিদিকে সৈন্যরা নেমে পড়েছে। ট্যাঙ্ক বের করেছে পথে। তখন অনেকেই ছুটে এসেছিল ৩২ নং রোডের এই বাড়ীতে। বলছিল-বঙ্গবন্ধু আপনি সরে যান। উত্তরে দৃঢ়ভাবে মাথা নেড়েছিলেন তিনি-না কোথাও আমি যাব না।

রাত ১০টা থেকেই গোলাগুলি শুরু হয়ে গেল। দূর থেকে তখন গুলির শব্দ ভেসে আসছিল। দেখলাম প্রতিটি শব্দ-তরঙ্গের সাথে সাথে শেখ সাহেব সমস্ত ঘরটার মাঝে পাইচারী করছিলেন। অস্ফুটভাবে তিনি বলছিলেন-এভাবে বাঙালীকে মারা যাবে না। বাংলা মরবে না। রাত ১২টার পর থেকেই গুলির শব্দ এগিয়ে এলো। ছেলেমেয়েদের জানালা বন্ধ করতে যেয়ে দেখতে পেলাম পাশের বাড়ীতে সৈন্যরা ঢুকে পগেছে। স্পস্ট মনে আছে এ সময়

আমি বাজের মতই এক ক্রুদ্ধ গর্জন শুনেছিলাম— গো অন, চার্জ —-

সেই সাথে সাথেই শুরু তলে অঝোরে গোলাবর্ষণ। এই তীব্র গোলাগুলির শব্দের মধ্যেও অনুভব করলাম – সৈন্যরা এবার আমার বাড়ীতে ঢুকেছে। নিরুপায় হয়ে বসেছিলাম আমার শোবার ঘরটাতে। বাইরে থেকে, মুসলধারে গোলাবর্ষন হতে থাকলো এই বাড়ীটা লক্ষ্য করে। ওরা হয়ত এই ঘরটার মাঝেই এমনিভাবে গোলাবর্ষণ করে হত্যা করতে ছেয়েছিল আমাদেরকে। এমনভাবে গোলাবর্ষিত হচ্ছিল যে মনে হচ্ছিল সমস্ত বাড়ীটা বোধহয় ধ্বসে পড়বে। বারুদের গন্ধে মুখচোখ জ্বলছিল। আর ঠিক সেই দুরন্ত মুহুর্তটাতে দেখছিলাম ক্রুদ্ধ সিংহের মত সমস্ত ঘরটার মাঝে অবিশ্বাস্যভাবে পায়চারী করছিলেন শেখ সাহেব। তাঁকে ঐভাবে রেগে যেতে কখনও আর দেখিনি।

রাত প্রায় সাড়ে ১২টার দিকে ওরা গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে উপরে উঠে এলো। এতক্ষণ শেখ সাহেব, ওদের কিছু বলেননি। কিন্তু এবার অস্থিরভাবে বেরিয়ে গেলেন তিনি ওদের সামনে। পরে শুনেছি সৈন্যরা সেই সময়ই তাঁকে হত্যা করে ফেলতো যদি না কর্ণেল দু’হাত দিয়ে তাঁকে আড়াল করতো । ধীর স্বরে শেখ সাহেব হুকুম দিলেন গুলি থামাবার জন্য । তারপর মাথাটা উঁচু রেখেই নেমে গেলেন তিনি নীচের তলায়। মাত্র কয়েক মুহুর্ত। আবার তিনি উঠে এলেন উপরে। মেজ ছেলে জামাল এগিয়ে দিল তার হাতঘড়ি ও মানিব্যাগ। স্বল্প কাপড় গোছানো সুটকেস আর বেডিংটা তুলে নিল সৈন্যরা যাবার মুহুতে একবার শুধু তিনি তাকালেন আমাদের দিকে । পাইপ আর তামাক হাতে নিয়েই বেরিয়ে গেলেন তিনি ওদের সাথে। সোফার নীচ থেকে, খাটের নীচ থেকে, আলমারীর পাশ থেকে বেরিয়ে এলো কয়েকজন দল কর্মী। রো আস্তে আস্তে বললো- মাগো আমরা আছি। আমরা আছি। ওদের সকলের মাঝে দাঁড়িয়ে সে রাতে কেঁদে ফেলেছিলেন বেগম মুজিব। বলেছিলেন—খোদার কাছে হাজার শোকর তোদের অন্তত: ফেরত পেয়েছি। তোরা অন্তত ধরা পড়িসনি। এ পর্যন্ত বলেই তিনি শেষ করলেন সেই রাত্রের কথা।”

সংকলক: উপপ্রধান তথ্য অফিসার, আঞ্চলিক তথ্য অফিস, ময়মনসিংহ

বঙ্গবন্ধুকে জুলিও কুরি শান্তি পদক প্রদান সম্মেলনে বিশ্বের মুক্তিকামী কণ্ঠস্বর মিলেছিল এক মোহনায়

যুদ্ধ-দারিদ্র্য-দুর্ভিক্ষমুক্ত শান্তিময় এশিয়া গড়ার আকাঙ্খায় বুধবার ২৩ মে, ১৯৭৩ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল এশীয় শান্তি সম্মেলন। সম্মেলন চলেছিল তিন দিন। উদ্বোধন করেছিলেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। সম্মেলন আয়োজন করে এশীয় শান্তি পরিষদ। সে সম্মেলনের প্রধান আকর্ষণ ছিল বঙ্গবন্ধুকে শান্তির জন্য জুলিও কুরি পদক প্রদান। এ পদক নোবেল শান্তি পুরস্কারের পরে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সবচেয়ে মর্যাদাশীল ও সম্মানিত শান্তিপদক। নিপীড়িত বাঙালী জাতির মুক্তির সংগ্রামে অতুলনীয় নেতৃত্ব প্রদানের জন্য বঙ্গবন্ধুকে এশীয় শান্তি পরিষদ এ পদকে ভূষিত করেছেন। সেদিনের সে সম্মেলনের মাধ্যমে বিশ্বের মুক্তিকামী কণ্ঠস্বর মিলেছিল এক মোহনায়। সে সম্মেলনের প্রবেশমুখে ব্রেজনেভ, হো চি মিন, বঙ্গবন্ধু, শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর প্রতিকৃতি। মঞ্চের দু’পাশে ছিল পদকের প্রতিষ্ঠাতা প্রখ্যাত বিজ্ঞানী জুলিও কুরি ও বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতী। সে সম্মেলনে উত্তর ভিয়েতনাম, দক্ষিণ ভিয়েতনাম, লাওস, দক্ষিণ আফ্রিকা, প্যালেস্টাইন, সোভিয়েত ইউনিয়ন, তৎকালীন জিডিআর, ভারত, হাঙ্গেরী, অস্ট্রেলিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বুলগেরিয়া, কানাডা, বৃটেন, মিশর, ইরাক, ফ্রান্স, জাপান, জর্দান, মালয়েশিয়া, মঙ্গোলিয়া, শ্রীলংকা, সিরিয়া, উত্তর ইয়েমেন, ওমান, পোল্যান্ড ইত্যাদি দেশের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। বাণী দিয়েছিলেন বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানগণ। জুলিও কুরি পদক সেদিন সম্মানিত হয়েছিল।

জুলিও কুরি শান্তি পদকে ভূষিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সেদিন বলেছিলেন, বিশ্বশান্তি আমার জীবন দর্শনের অন্যতম মূলনীতি। নিপীড়িত, নির্যাতিত, শোষিত এবং শান্তি ও স্বাধীনতাকামী সংগ্রামী মানুষ-সে বিশ্বের যে কোন স্থানেই হোক না কেন, তাদের সাথে আমি রয়েছি।

উদ্বোধনী ভাষণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন, সকলের

কাছে বন্ধুত্ব-কারো প্রতি বিদ্বেষ নয়, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতিতে আমরা আস্থাশীল। আমরা সর্বপ্রকার অস্ত্র প্রতিযোগিতার পরিবর্তে দুনিয়ার সকল শোষিত ও নিপীড়িত মানুষের কল্যাণে বিশ্বাসী বলেই বিশ্বের সব দেশ ও জাতির বন্ধুত্ব আমরা কামনা করি। সামরিক জোটগুলির বাহিরে থেকে সক্রিয় নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি আমরা অনুসরণ করে চলেছি। প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, শুধু সরকারের নীতিই নয়-আন্তর্জাতিক শান্তি ও সংহতি সুদৃঢ় করা আমাদের সংবিধানের অন্যতম অনুশাসন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান তার ভাষণে বলেছিলেন, আমরা মুক্তি সংগ্রামের আলোকেই জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের মূল্য অনুধাবন করেছি প্রতি অনু-পরমাণুতে। আমরা জানি মুক্তিকামী মানুষের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রাম অস্ত্রের জোরে স্তদ্ধ করা যায় না। সেজন্য ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, লাওস, এঙ্গোলা, মোজাম্বিক, বিসাউসহ দুনিয়ার সকল উপনিবেশবিরোধী সংগ্রামের প্রতি আমরা জানিয়েছি অকুণ্ঠ সমর্থন।

বঙ্গবন্ধু অন্যায়ভাবে আরব এলাকা জোরপূর্বক দখলে রাখার জন্য ইসরাইলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ ও দক্ষিণ আফ্রিকাসহ বিশ্বের সকল স্থানের বর্ণভেদবাদী নীতিকে দ্বিধাহীন চিত্তে নিন্দা জ্ঞাপন করেন সে সম্মেলনে ভাষণ দানকালে। সেই সঙ্গে বিশ্বশান্তি নিয়ন্ত্রীকরণ ও মানব কল্যাণের যে কোন সৎ প্রচেষ্টার প্রতি জানিয়েছিলেন অকুণ্ঠ সমর্থন।

বাংলাদেশ-ভারত-পাকিস্তান উপমহাদেশের স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে পাকিস্তানের বৈরী মনোভাবের জন্য দুঃখ প্রকাশ করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন, পাকিস্তান বার বার উপমহাদেশের নতুন বাস্তবতাকে মেনে নিতে অস্বীকার করে এসেছে। স্থায়ী শান্তি ও মানবিক কল্যাণে আমাদের উদ্যোগের সর্বশেষ প্রমাণ ১৭ই এপ্রিলের ভারত-বাংলাদেশ দৃপ্ত ঘোষণা। এই ঘোষণায় স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার সূত্র খুঁজে বের করার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে মানবিক সমস্যা সমাধানের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে। এই প্রস্তাবে অনুকূল সাড়া দেয়ার পরিবর্তে পাকিস্তান প্রতিহিংসামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে পাকিস্তানে বেআইনীভাবে আটক নিরপরাধ বাঙালীদের বন্দীনিবাসে অবরুদ্ধ করে রেখেছে। প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, এইভাবে পাকিস্তানের একগুয়ে নীতি উপমহাদেশ স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার পরে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। পাকিস্তানের অস্ত্র সরবাহ প্রসঙ্গে কারো নাম উল্লেখ না করে প্রধানমন্ত্রী আরো বলেছিলেন, কেউ কেউ আবার

নতুন করে পাকিস্তানকে সজ্জিত করে চলেছেন নতুন নতুন সমরাস্ত্রে। নিঃসন্দেহে এটা স্থায়ী শান্তির যে কোন শুভ উদ্যোগের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারে। বঙ্গবন্ধু এ ব্যাপারে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এশীয় শান্তি সম্মেলনে বলেছিলেন, আমরা চাই বিশ্বের সর্বত্র শান্তি বজায় থাকুক। তাকে সুসংহত করা হোক। বৃহৎ শান্তিবর্গ বিশেষভাবে আগ্রাসী নীতি অনুসারী কতিপয় মহাশক্তির অস্ত্রসজ্জা তথা অস্ত্র প্রতিযোগিতার ফলে আজ এক সংকটজনক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এর ফলে অনুন্নত ও উন্নয়নকামী দেশসমূহের অর্থনৈতিক সাহায্য সংক্রান্ত মহা ঘোষণাগুলিও মূল্যহীন বলে প্রমাণিত হতে চলেছে। এই অস্ত্র প্রতিযোগিতার চক্রধারায় জড়িয়ে পড়ছে ছোট-বড়-মাঝারি অনেক দেশ। ফলে নানাভাবে বিভিন্ন দেশের সামরিক বাজেট হচ্ছে স্ফীত। এ অবস্থার অবসান আমাদের একান্ত কাম্য। আমরা চাই অস্ত্র প্রতিযোগিতায় ব্যয়িত অর্থ দুনিয়ার দুঃখী মানুষের কল্যাণের জন্য নিয়োগ করা হোক। তাহলে পৃথিবী থেকে দারিদ্র্যের অভিশাপ মুছে ফেলতে কাজ অনেক সহজসাধ্য হবে।

জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমান উদ্বোধনী ভাষণের শুরুতে বলেছিলেন, শ্যাম-সবুজ বাংলাদেশের সোনার মানুষ যুগ যুগ ধরে একান্তভাবে কামনা করেছে নিরবিচ্ছিন্ন শান্তি। কিন্তু পেয়েছে শুধু বিভিন্ন ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠীর হিংস্র ছোবল। যার পরিণতিতে আমাদের অর্থনীতি হয়েছিল বিপর্যস্ত। উপনিবেশবাদী শাসন আর শোষণের নগ্ন হামলাকে প্রতিরোধ করে ত্রিশ লক্ষ শহীদের প্রাণের বিনিময়ে আমরা ছিনিয়ে এনেছি আমাদের জাতীয় স্বাধীনতা।

জাতির পিতা আরো বলেছিলেন, বাংলাদেশের মানুষের কাছে তাই শান্তি আর স্বাধীনতা একাকার হয়ে মিশে গেছে। পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক শাসকচক্রের গণহত্যা, বর্বরতম জংলী নীতি ও সর্বাপরি চাপিয়ে দেয়া যুদ্ধকে প্রতিহত করে এক সাগর রক্ত দিয়ে আমাদের স্বাধীনতা লাভ করতে হয়েছে। আমরা মর্মে মর্মে অনুধাবন করি, বিশ্বশান্তি তথা আঞ্চলিক শান্তির অপরিহার্যতা। বঙ্গবন্ধু বলেন, বিশ্বশান্তি পরিষদই একমাত্র সংস্থা যারা বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেছিলেন। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে বিশ্বশান্তি পরিষদের অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। প্রধানমন্ত্রী আরো বলেছিলেন, বাংলাদেশের চরম দুঃসময়ে বিশ্বশান্তি পরিষদ আমাদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেছিলেন। এ দেশের মানুষও ঠিক একইভাবে বিশ্বশান্তি আন্দোলনের সাথে সহমর্মিতা জানিয়ে এসেছেন। বঙ্গবন্ধু

স্মৃতিচারণ করে বলেছিলেন, আমি নিজে পিকিং (বেইজিং) এ অনুষ্ঠিত প্রথম এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলীয় শান্তি সম্মেলনে একজন প্রতিনিধি ছিলাম। বিশ্বশান্তি পরিষদের ১৯৫৬ সালের স্টকহোম সম্মেলনে আমি যোগ দিয়েছিলাম। বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, আমরা একটি শোষণমুক্ত সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করতে চাই। যুগ যুগ ধরে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ এবং পাকিস্তানের ২৪ বছরের উপনিবেশবাদী লুণ্ঠন, সর্বোপরি নয় মাসে পাকিস্তানী বাহিনীর হামলার ফলে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক মেরুদন্ড ভেঙ্গে পড়েছে। আর বাংলার দুঃখী মানুষের ঘরে ভাত নেই। পরণের কাপড় নেই। এই ভুখা-নাঙ্গা মানুষকে বাঁচানোর জন্য আমাদের সংগ্রাম। এই সংগ্রাম বুভুক্ষা, বেকারত্ব, দারিদ্র ও নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে। এই সংগ্রাম সফলকাম হওয়ার জন্য আমাদের শান্তিপূর্ণ পরিবেশ প্রয়োজন। এই জন্যই উপমহাদেশসমূহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াকে শান্তির এলাকা ঘোষণার আহ্বান জানিয়েছিলাম।

শান্তি পদক গ্রহণ করে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, এ সম্মানের জন্য আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু এ সম্মান কোন ব্যক্তি বিশেষের নয়। এ সম্মান বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মদানকারী শহীদদের। মুক্তি সংগ্রামের বীর সেনানীদের। জুলিও কুরী শান্তিপদক সমগ্র বাঙালী জাতির। আমার দেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের। এ সম্মেলনে যোগদানের জন্য যুক্তরাষ্ট্র থেকে আগত প্রতিনিধি মিঃ ডীন বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ সকল সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে বাংলাদেশের জনসাধারণ সংগ্রামের এক অনন্য দৃষ্টান্ত ও অনুপ্রেরণা। তিনি বলেন এতে বিশ্বেও মুক্তিকামী মানুষকে অনুপ্রাণীত করা হলো।

বিশ্বশান্তি পরিষদের সেক্রেটারী জেনারেল শ্রী রমেশচন্দ্র বলেন, বঙ্গবন্ধু শান্তি ও স্বাধীনতার অগ্রদূত এবং বিশ্বেও মহান মানব। বাংলাদেশের স্বাধীনতার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে লিপ্ত বিশ্বের স্বাধীনতাপ্রেমীদের উদ্বুদ্ধ করেছেন।
এখনো বিশ্বেও বিভিন্ন দেশে সা¤◌্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে শান্তিকামী মানুষেরা মুক্তির সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন। তারা শান্তির অন্বেষায় রক্ত বিলুচ্ছেন আর বঙ্গবন্ধুর মত একজন মুক্তিকামী নেতা খুঁজে ফিরছেন। মুক্তির এ সংগ্রামে আমাদের হাতও মুষ্ঠিবদ্ধ হোক, কণ্ঠ গর্জে উঠুক- বঙ্গবন্ধুকে জুলিও কুরি শান্তি পদক প্রদানের সুবর্ণজয়ন্তীতে এই হোক প্রত্যাশা।

লেখকঃ উপপ্রধান তথ্য অফিসার, আঞ্চলিক তথ্য অফিস, ময়মনসিংহ, পিআইডি, ময়মনসিংহ

বাইরে মুক্তির কল্লোল ও বন্দী একটি পরিবার

আজ বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব ৯১তম এর জন্মদিন। ‘অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর’ এ কথাটির জ¦লন্ত প্রমাণ বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ‘বঙ্গবন্ধ’◌ুতে রূপদান করেছেন ছায়ার মত পাশে থেকে। তাঁর পারিবারিক জীবনের ত্যাগ বঙ্গবন্ধুকে নির্ভার হয়ে রাজনৈতিক কর্মকান্ড চালিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। বঙ্গবন্ধুর প্রতিটি বিপদে, আন্দোলন-সংগ্রামে তিনি সাহস যুগিয়েছেন। তাঁকে পরিবারের কোন ব্যক্তিগত বা আর্থিক টানা পোড়েনের বিষয় বঙ্গবন্ধুর কাছে তুলে ধরার ইতিহাস দেখা যায়না। নিজে বরং বিভিন্ন সময়ে বঙ্গবন্ধুকে টাকা পাঠিয়েছেন। জেল খানায় গিয়ে দেখাক রেছেন। কখনো বলতে দেখা যায়নি যে, তিনি বঙ্গবন্ধুকে রাজনীতি ছেড়ে দিয়ে সংসার মুখী হতে বলেছেন। বরং পরম ভালবাসায় বঙ্গবন্ধুকে সিক্ত করেছেন। পরিবার টিকে তিনি আগলে রেখেছেন যেমন মা পাখি তার বাচ্চাদের আগলে রাখে।

বঙ্গমাতাকে জানা মানে বাংলাদেশের ইতিহাসকে জানা। ইতিহাসের তিনি এক জীবন্তসাক্ষী। তাই বারবার তিনি পত্রিকায় ওঠে এসেছেন। দেশবাসীকে ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায় জানাতে সাহায্য করেছেন। মুক্তিযুদ্ধের নয়টি মাস তিনি পরিবারের সদস্যদের নিয়ে কেমন করে কাটিয়েছেন Ñ একাধিক সাক্ষাৎকারে তা উঠে এসেছে। এমনি একটা সাক্ষাৎকার ছাপা হয় ১৯৭৩ সালের ১৬ই ডিসেম্বরের দৈনিক বাংলায়। সাক্ষাৎকারটি নিয়ে ছিলেন শ্রদ্ধেয়া হাসিনা আশরাফ। এটি মূলতঃ ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বরের দিন নিয়ে। নতুন প্রজন্মের জন্য তা তুলে ধরা হলো।

‘ডিসেম্বরকে আমি স্মরণ করবো, জীবনের শেষ মুহুর্ত পর্যন্ত। ১৬ই ডিসেম্বর আমাকে দিয়েছে এক অনন্য উপলব্ধি। এই দিনটির মাঝেই আমি পেয়েছিলাম নতুন জীবনের প্রতিশ্রুতি’Ñ বললেন শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব।

১৬ই ডিসেম্বরকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে থাকেন বেগম মুজিব।

দু’বছরের ব্যাবধানেও তাঁর কাছে অস্পষ্ট হয়ে যায়নি ১৬ই ডিসেম্বরের অনন্য মুহুর্ত গুলো। প্রতি বছর উত্তরের হিমেল হাওয়ার সাথে ডিসেম্বর যেনো ফিরে আসে অতীত স্মৃতি নিয়ে। নিজের অজান্তেই তিনি ফিরে যান ধানমন্ডির ১৮ নং রোডের সেই এক তলা বাড়ীটিতে। বন্দী জীবনের সেই বাসাটিতে মুক্ত সুর্যের আলো যেনো বাধা পেতো। এক চিলতে ছাঁয়াও পড়তো না তাঁর ঘরটিতে।
১৯৭১ সালের গণসংগ্রামে দীপ্ত দিনগুলোকে স্মরণ করতে বেগম মুজিবের ভালো লাগে। আকাশে জঙ্গী বিমানের প্রচন্ড শব্দ শুনলে এখনো তিনি বেরিয়ে আসেন ঘর থেকে। দু’বছর আগেও এমনি করে জঙ্গী বিমানের আনাগোনায় আচমকা তিনি বেরিয়ে আসতেন ঘর থেকে বাইরে। অশরীরী ছায়ার মত অনুসরণ করতো তাঁকে বেয়নেট ধারী প্রহরী। নিঃশব্দে তখন ফিরে যেতেন ঘরে। এ সময় জঙ্গী বিমানের শব্দে বেশী ঘাবড়া তো ছোট্টরাসেল। বিমানের শব্দ পেলেই চিৎকার করে সে ছুটে যেতো তার ছোট্টভাগ্নেটার (জয়) দিকে। পকেট থেকে তুলা বের করে জয়ের কানে গুঁজে দিতো। তারপর ছোট্ট ভাগ্নেটাকে বুকে চেপে ধরে তার মায়ের পাশেই বসে থাকতো শীর্ণ মুখে। এক বার । দুইবার। তিনবার। যতবার বিমান আসতো, ঠিক ততবার ইরাসেল দৌড় দিতো জয়ের কাছে। একই ভাবে কানে তুলা গুঁজে দিতো তার অবুঝ ভাগ্নেটাকে।

দু’বছর কেটে গেছে। মনেপড়ে সেই স্মৃতি। বন্দী জীবনের কালো দিনগুলো ভুলতে পারেননি বেগম মুজিব। মনেপড়ে সেই মানসিক নির্যাতনের কথা। মনেপড়ে সেই দুঃসহ মুহুর্তগুলো। শুধুমাত্র বুকের বল সম্বল করে কাটিয়ে দিতে হয়েছিল মাসের পর মাস। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়া ছাড়াও পরিবারের সবার মনে সাহস যোগাতে হতো তাঁকে। আগস্ট মাসে তাঁর দ্বিতীয়পুত্র বন্দী জীবনের চৌহদ্দি পেরিয়ে পালিয়ে গেল। সন্তানের চিন্তায় স্নেহাকূল মায়ের মনের ভেতরটা জ¦লে যেত। কিন্তু বাইরে তিনি নির্বিকার ভাব দেখাতেন। ঠান্ডা মাথায় ব্যাপারটি ধামা চাপা দেবার জন্য প্রহরীদের কাছেই তিনি দাবী করতেনÑ‘আমার ছেলেকে ফিরিয়ে দাও’। অনেক কামনার ধনপ্রথম নাতীর জন্ম মুহুর্তেও বেগম মুজিব যেতে পারেন নিকন্যার শয্যাপার্শে। কিন্তু পরিবেশকে অনুধাবন করে নিজেকে সংযত রেখেছিলেন তিনি। গোপনে খবর পাঠিয়ে ছিলেণ ননদের কাছে। আরনিজে বেছেনিয়ে ছিলেন জায়নামাজ। ‘জানেন, সেই দুঃসহ স্মৃতি বাইরের আলোতে মেলে ধরতে ভালো লাগেনা আমার। কেননা অনুভূতি কখনও পুরোপুরি বুঝানো যায় না। কিকরে সে ব্যথা প্রকাশ করবো?

বিগত কয়েক মাস আমি অসুস্থ ছিলাম। দেশী-বিদেশী চিকিৎসকরা দেখেছেন।

ঔষধ খেয়েছি। এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ নই। ছেলে মেয়েরা বলে, সেই সময় কার মানসিক চাপ ও ক্লেশের জন্য ক্লান্ত হয়ে পড়েছি ধীরে ধীরে। অসুখ সহ্য করার ক্ষমতা কবে হারিয়ে গেছে।

কথা বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেলেন বেগম মুজিব। কিছুক্ষণ চুপকরে থেকে বললেনÑ‘নতুন বলার কিছুই নেই। একদিকে তখন স্বপ্ন দেখেছিমুক্ত স্বাধীন বাংলার আর অন্যদিকে ভেবেছি পাকিস্তানী কারাগারে বন্দী আমার স্বামী রউ পর নির্যাতনের কথা। ভেবেছি পরিবারের ভবিষ্যতের কথা। জীবন আর মৃত্যুর সেই টানা পোড়েনের মুহুর্তগু লোকে ব্যাখ্যা করার ভাষা আমার নেই।’

১৬ই ডিসেম্বরের কথা বলতে গিয়ে কেমন যেনো অন্যমনস্ক দেখালো বেগম মুজিবকে। একটু থেমে বললেনÑ‘সারা জীবন মনে থাকবে এই দিনটি। ডিসেম্বর মাসের শুরু থেকেই বাইরের জগতের সাথে আমাদের পরিবারের সম্পর্ক কেটে দিয়েছিল পাকিস্তানীরা। আমরা ছিলাম চার দেয়ালের মধ্যে বন্দী। তবুও মুক্তি সংগ্রামের সব খবরইআমি পেতাম। ধন্যবাদ আমার ট্রান জিস্টরকে। ১৫ই ডিসেম্বর রাতেই জানতে পেরেছিলাম পাকিস্তানী সেনাদের ভরাডুবির কথা। তাহলে আমরা স্বাধীন হচ্ছি! মুক্তি তরঙ্গের দোলা লেগেছে ছোট্ট পরিবারটিতে। কেমন যেনো ঝকমক করছে সবার চোখমুখ। নিজেকে ওআর সম্বরণ করতে পারছিলাম না।

১৬ই ডিসেম্বর সকাল ১০টার দিকে একটি মিলিটারী জীপ এসে আমার বাসার দু’জন সিকিউরিটি অফিসারকে তুলেনিয়ে গেল। বাসায় থেকে গেল নিম্নপর্যায়ের হাবিলদার সহপাহারারত সেপাইরা। বেলা বাড়তে লাগলো। ততক্ষণে শোন ◌াযাচ্ছে জয় বাংলা ধ্বনি। পাঞ্জাবী প্রহরীরা অস্থির হয়ে উঠেছিল। বুঝলাম হয়তো বা আমাদের জন্য মৃত্যু আসন্ন। ছোট্ট রাসেল আর পাঁচ মাসের নাতীটির দিকে তাকিয়ে কষ্ট হচ্ছিল। ওদের দু’জনকে সারাদিন লুকিয়ে রাখলাম বাথরুমের অন্ধকার কোণে। একপাশের ছোট্ট ঘরের মধ্যেই আমরা সকলে লুকালাম। বাইরের কলগুঞ্জন ক্রমেই বাড়ছে। আর শোনা যাচ্ছে জয়বাংলাধ্বনি। হঠাৎ ছাদেরওপর থেকে মেশিনগানের গুলিবর্ষণহল। বেপরোয়া ভাবে ছাদের উপর থেকে ক্ষিপ্ত সৈনিকরা গুলি চালাতে লাগলো পথচারীদের ওপর। দুপুর গড়িয়ে সন্ধ্যা হয়ে এলো। আমারবাসাটিকেঘিরেতখন এক বিশৃংখলঅবস্থা। শান্ত ভাবে তাই ডাক দিলাম হাবিলদার রিয়াজকে। বুঝিয়ে বললাম যে, তাদের সেনা নায়ক নিয়াজী আত্মসমর্পণ করেছেন। তারা যেনো অযথা নিরীহ লোকদের হত্যা না করে। আমার কথা শুনে রক্তচক্ষু মেলে ধমক দিয়ে উঠলো সে। বলল, নিয়াজীকে সে চেনেনা। নিজে সে আত্মসমর্পণকরেনি। কাজেই বাজে কথা যেনো কেউ নাবলে।

দু’বছর আগের স্মৃতি। এক মিশ্রিত অনুভূতি নিয়ে ফিরে আসে দিনটি। সমস্ত রাত গোলাগুলির আওয়াজ। এক মিনিটের জন্যও থামেনি। ঘরের ভিতর সবাই আমরা প্রহর গুণছি। দরজার ওপাশ থেকে ভেসে আসছে ভারী বুটের আওয়াজ। রাত তখন প্রায় নয়টা। ঘরের ভিতরের বাচ্চাদের জামা-কাপড় শুকাতে দেবার তারটা হঠাৎ নড়ে উঠলো। এক লাফে উঠে দাঁড়ালেন বেগমমুজিব। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে হাবিলদার রিয়াজ। লাল রক্তের মতজ¦লন্ত চোখে সে তাকালো। বললোÑ খোকাকে (শেখ সাহেবের ভাই) পাঠিয়ে দিন। কথা আছে। সহসে ভর করে বেগম মুজিব এগিয়ে গেলেন। বললেনÑওরা ঘুমিয়ে আছে। যা কিছু বলতে চাও আমাকেই বলতে পারো। উত্তর শুনে হিংস্র দৃষ্টিতে ঘরের দিকে চেয়ে ফিরে গেল রিয়াজ। রাত যেনো কাটতে চায়না। স্বাধীনতার স্পর্শে রঙিন বাংলা মেতে উঠেছে উৎসবের আমেজে। আর এদিকে বন্দী পরিবারটিতে রাত জাগছেন এক স্নেহময়ীমা। মৃত্যু যার শিয়রে করা ঘাত করছে।

১৬ই ডিসেম্বরের সেই কালো রাতের পর দুটো বছর কেটে গেছে। বেগম মুজিব আজও স্মরণ করে শিউড়ে ওঠেন মৃত্যু নীল সেইরাতটিকে। বর্ণনা করতে গেলে এখন স্মিতহাস্যে শুধু বলেনÑঅনুভূতিঠিক প্রকাশ করা যায় না—।

লেখক: পরিচালক, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়।